পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সংহতির সমস্যা

ফেরদৌস হোসেন*

সার–সংক্ষেপ ঃ *বাংলাদেশের দক্ষিণ–পূর্বাঞ্চলীয় পাবর্ত্য জেলাসমূহে বসবাসরত উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের পটভূমি ও বিভিন্ন পর্যায় এবং উক্ত স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সংহতির ক্ষেত্রে যে সমস্যার জন্ম দিয়েছে, তা এ প্রবন্ধে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রবন্ধের ভূমিকায় জাতিগঠন প্রক্রিয়া এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জাতীয়তার প্রশ্নকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রীয় সংহতির যে সংকট দেখা দিয়েছে তা উল্লেখ করার পর জাতিরাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা ও বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর অবস্থান চিহ্নিত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে অত্র অঞ্চলে বসবাসকারী উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর আর্থ–সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় নির্ধারণ সাপেক্ষে বাঙালী জনগোষ্ঠীর সাথে তাদের স্বাতন্ত্রের প্রশ্নটিও আলোচিত হয়েছে।*

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের জন্যে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের উত্থাপিত দাবীর একটি ঐতিহাসিক পটভূমি রয়েছে। উল্লেখ্য, ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে ঐ অঞ্চলের প্রশাসনিক বিন্যাস ও "আঞ্চলিক স্বাতন্ত্রের" এবং পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে আঞ্চলিক স্বাতন্ত্রের অনুপস্থিতি এবং বাঙালী জাতীয়তার প্রবল স্রোতের মধ্যে উপজাতীয় সংস্কৃতির আত্মীকরণের সাংবিধানিক–রাজনৈতিক প্রেক্ষিত স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের ভিত্তি সৃষ্টি করে। আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য ও উপজাতীয় সংস্কৃতির স্বীকৃতির পক্ষে উত্থাপিত দাবী এবং আর্থ–সামাজিক প্রতিকূলতা বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বাঙালী বসতি স্থাপনের ফলে সৃষ্ট উপজাতীয় সংকট নিরসনের প্রচেষ্টা একটি সংগঠিত রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে, আর প্রত্যুত্তরে সেই রাজনৈতিক আন্দোলন দমনের সরকারী প্রচেষ্টাও বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। এ পর্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক আন্দোলনের সশস্ত্র চরিত্র এবং সরকারী পর্যায়ের সামরিক পদক্ষেপের পরিধি ও গভীরতা সম্পর্কে আলোচনা করার পর সমস্যা সমাধানের কতিপয় রাজনৈতিক উদ্যোগ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়।

প্রবন্ধের শেষ প্রান্তে উপজাতীয়দের সশস্ত্র আন্দোলনের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব–বিরোধ ও গতি–প্রকৃতি পর্যালোচনা করে আন্দোলনের বর্তমান পর্যায় এবং এর ভবিষ্যৎ পরিণতি সম্পর্কে ধারণা দিয়ে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সংহতি দৃঢ়করণের প্রয়োজনীয়তার আলোকে উক্ত সমস্যার একটি রাজনৈতিক সমাধানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

এক

ষোড়শ শতকে জাতীয়তাবাদের ধারণা উত্থাপিত হবার পর থেকে পর্যায়ক্রমে এই ধারণা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরিস্ফুট হতে শুরু করে এবং জাতীয়তার ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়া বাস্তব রূপ লাভ করে। মধ্যযুগীয় সামন্তবাদী সমাজ কাঠামো তার অভ্যন্তরীণ

---

* সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে পরিবর্তিত হয় এবং সামন্ত সমাজের ভিত্তির উপর গড়ে ওঠা সাম্রাজ্যিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙে গিয়ে জাতীয়তার ভিত্তিতে আধুনিক রাষ্ট্রের উত্থান ঘটে। অর্থাৎ ইউরোপে আধুনিক জাতীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থা সৃষ্টি হয় সমাজের অভ্যন্তরীণ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে বিকশিত নূতন সামাজিক শক্তির উপর ভিত্তি করে। কিন্তু এশিয়া ও আফ্রিকার জাতীয়তাবাদের ধারণা গড়ে উঠেছিলো একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে। এসব অঞ্চলে জাতীয়তাবাদের অভিব্যক্তি ঘটে উপনিবেশিক শাসককে বিতাড়িত করে জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ এসব অঞ্চলের উপনিবেশসমূহে ভিন্ন চরিত্রের জনসমষ্টির অস্তিত্ব থাকলেও তারা বিদেশী শাসককে বিতাড়ণের প্রশ্নে এক অভিন্ন রাজনৈতিক স্রোতোধারায় মিলিত হয়ে একটি একক রাষ্ট্রসত্তার মধ্যে অন্তর্লীন হয়ে যায়। এখানে রাষ্ট্রই জাতীয়তার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে অর্থাৎ রাষ্ট্রের ভিত্তিতেই এখানে জাতীয়তাবাদ গড়ে ওঠে। তবে একথা সত্য যে, জাতীয়তার ভিত্তিতে যেসব রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে তারাও রাষ্ট্রের ভিত্তিতেই জাতীয়তার প্রতিষ্ঠাকে পূর্ণতা প্রদান করে। অর্থাৎ রাষ্ট্রসত্তার সাথে জাতিসত্তার মিলনের মধ্য দিয়েই আধুনিককালে জাতীয়তাবাদ পূর্ণতা লাভ করে।

মূলত অষ্টাদশ, উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর বিস্তৃত পরিধিতে জাতীয়তাবাদ ও জাতিরাষ্ট্রের বিকাশ ব্যাপকভাবে লক্ষণীয়। কিন্তু জাতীয়তার ভিত্তিতে রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রের ভিত্তিতে জাতীয়তা, যেভাবেই জাতিরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হোক না কেন রাষ্ট্রের মধ্যে জাতীয়তার সমস্যা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কোন না কোনভাবে থেকেই গেছে। রাষ্ট্রের মধ্যে জাতীয়তার সমস্যাকে মোকাবেলা করার প্রশ্নে মার্কসবাদী ও উদারতাবাদীদের ধারণায় ভিন্নতা থাকলেও উভয় স্কুলই জাতিগঠনের সমস্যাকে চিহ্নিত করেছে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে। মার্কসবাদীদের মতে, পুঁজিপতি শ্রেণী ও শ্রমজীবী শ্রেণীর মধ্যেকার শ্রেণী সংগ্রামের পরিণতিতে শ্রমজীবী শ্রেণীর বিজয়ের মধ্য দিয়ে অর্থাৎ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই জাতিগত পার্থক্য দূরীভূত হবে। কেননা, সমাজতান্ত্রিক সামাজিক কাঠামোর মধ্যে উৎপাদন যন্ত্রের উপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা এবং শ্রমের সামাজিক ব্যবহার মানুষে মানুষে এবং জাতিতে জাতিতে পার্থক্য দূরীভূত করে রাষ্ট্রীয় সংহতি নিশ্চিত করবে। অপরদিকে উদারপন্থীদের মতে, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে সৃষ্ট সামাজিক গতিশীলতা মানুষের সনাতন সম্পর্ককে অর্থাৎ ভাষা ও ধর্মগত বন্ধনকে বিদূরিত করে রাষ্ট্রীয় সংহতিকে দৃঢ় করবে। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, রাষ্ট্রীয় সংহতি একটি অত্যন্ত জটিল এবং বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া বিভিন্ন দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং ইতিহাসের উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়। তবে একটি ভূ-খন্ডের রাজনৈতিক পরিধির মধ্যে সমগ্র জনগোষ্ঠীর এক অভিন্ন স্রোতোধারায় মিলিত হবার মধ্য দিয়েই রাষ্ট্রীয় সংহতি গড়ে ওঠে।

বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জাতীয়তার প্রশ্নকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রীয় সংহতি বিপন্ন হতে চলেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ পূর্ব

ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে এই সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করে 'সোভিয়েত ইউনিয়ন' ভেঙে গেছে এবং প্রজাতন্ত্রগুলো স্বাধীনতা লাভ করেছে। যুগোশ্লাভিয়া এবং চেকোস্লোভাকিয়াতে স্লাভ জাতীয়তাবাদী সমস্যা প্রকট হয়ে উঠেছে। শুধু সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতেই নয়, অনেক ধনতান্ত্রিক দেশেও এই সমস্যা প্রচন্ড রূপ ধারণ করেছে। কানাডার কুইবেকে, স্পেনের বাস্ক ও ক্যাটালোনিয়া এবং গ্রেট বৃটেনের উত্তর আয়ারল্যান্ডে এ সমস্যা বিদ্যমান রয়েছে। ভারতের পাঞ্জাব, কাশ্মির, মিজোরাম প্রভৃতি স্থানে স্বাধীনতার আন্দোলন গড়ে উঠেছে। মধ্যপ্রাচ্যে কুর্দীদের জাতীয়তাবাদী চেতনা ইরান, ইরাক ও তুরস্কে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে পরিব্যাপ্ত। কুর্দীরা স্বাধীন কুর্দীস্তানের জন্যে ইরান, ইরাক ও তুরস্কের সাথে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। রুমানিয়ার হাঙ্গেরীয়, যুগোশ্লাভের আলবেনীয়, বুলগেরিয়ার তুর্কী সংখ্যালঘুদের ও তিব্বতীদের জাতীয়তাবাদী চেতনা অত্যন্ত শক্তিশালী এবং এই জাতীয়তাবাদী চেতনা সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলোর সংহতিকে বিনষ্ট করে ফেলতে পারে।

জাতীয়তার প্রশ্নে আধুনিককালে রাষ্ট্রীয় সংহতির যে সমস্যা বিশ্বব্যাপী প্রকট হয়ে উঠেছে তা থেকে বাংলাদেশও মুক্ত নয়। ১৯৪৭ সালে উপনিবেশের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় দ্বিজাতি–তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে যে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছিলো তা বাঙালী জাতীয়তার প্রশ্নে দ্বিখন্ডিত হয়ে বাংলাদেশের জন্ম হয়। বাংলাদেশ উপনিবেশিকতার ধারাবাহিক পর্যায় পেরিয়ে যে রাষ্ট্রীয় রূপ পরিগ্রহ করে সেখানে উপনিবেশিক রাষ্ট্রের অনেক বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান থাকে। উপনিবেশিক আমলের আমলাতন্ত্র, সামরিক বাহিনী ও আইনী কাঠামোর আওতায় বিন্যস্ত হয় এই সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রটি। কিন্তু এই নূতন রাষ্ট্রটি উপনিবেশিকতার উত্তরাধিকার হিসেবে শক্তিশালী প্রশাসনযন্ত্র লাভ সাপেক্ষে বাঙালী জাতীয়তার ভিত্তিতে জাতি–রাষ্ট্রের রূপ পরিগ্রহ করলেও দেশের দক্ষিণ–পূর্বাঞ্চলের পার্বত্য জেলাসমূহে বসবাসকারী উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর আত্মীকরণের প্রশ্নে রাষ্ট্রীয় সংহতি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাঙালী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে গঠিত বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মধ্যে উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর নিজস্ব সত্তার প্রশ্নটি অস্পষ্ট এবং সংবিধানে অব্যক্ত। ফলে উপজাতীয় জনগোষ্ঠী বাঙালী জাতীয়তাবাদের প্রবল স্রোতের মধ্যে নিজেদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের সমস্যায় নিপতিত। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার তুলনায় উপজাতীয়রা এতই ক্ষুদ্র যে, তাদের অস্তিত্ব জাতীয় পরিধিতে খুবই নগণ্য। এ কারণে তাদের মধ্যে সামাজিক নিরাপত্তা এবং সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা সংরক্ষণের সমস্যা স্বাভাবিকভাবেই প্রবল হয়ে দেখা দেয়। উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক গতিশীলতা কম থাকায় এবং অনেকাংশে সনাতন উৎপাদন ব্যবস্থা ধরে রাখার কারণে তারা নিজস্ব পরিধির মধ্যেই বাঁধা পড়ে আছে। ফলে রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় পরিসরে মূল স্রোতোধারা হতে তারা প্রায় বিচ্ছিন্ন; যদিও তাদের এই বিচ্ছিন্নতা প্রধানত অবস্থানগত বাস্তবতা হতে সৃষ্ট। কার্যত বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের উপজাতীয় জনগোষ্ঠী জাতীয় রাষ্ট্রের পরিধিতে আত্মনিয়ন্ত্রণের সংগ্রামে লিপ্ত।

তাদের এই সংগ্রাম বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সংহতির ক্ষেত্রে প্রকট সংকট হিসেবে দেখা দিয়েছে। রাষ্ট্রীয় পরিধির মধ্যে উপজাতীয়তার আত্মীকরণ অথবা জাতীয় পর্যায়ে উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর সমন্বয় না ঘটলে এই সমস্যা জাতীয় সংহতির সমস্যা বা রাষ্ট্রীয় ঐক্যের সমস্যা হিসেবে থেকেই যাবে। তাই এই সমস্যার গুরুত্ব বাংলাদেশের রাজনৈতিক জীবনে অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী।

দুই

সাধারণ বিবেচনায় বাংলাদেশ একটি 'এক জাতি' অধ্যুষিত রাষ্ট্র। কেননা, জনসংখ্যার প্রায় ৯৯ ভাগই বাংলা ভাষায় কথা বলে এবং বাংলা সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রশ্নে গৌরববোধ করে। বাঙালী হিসেবে পরিচিত ও পরিচয় প্রদানকারী এ দেশের বিভিন্ন ধর্মের অধিকাংশ মানুষ অভিন্ন জাতীয়তার বন্ধনে সংযুক্ত। পাশাপাশি মোট জনসংখ্যার মাত্র প্রায় ১ ভাগ ভিন্ন পরিচয়ে পরিচিত। এরা সাধারণভাবে 'উপজাতীয় জনগোষ্ঠী' হিসেবে অভিহিত। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামেই সর্বাধিক সংখ্যক উপজাতীয়ের বাস। এদের মধ্যে রয়েছে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, মুরং, তেংচ্যাঙ্গা, বৌম, রিয়াং, পাংখু, খুমী, খায়াং, ম্রো, চাক ও লুসাই। তবে মগ সম্প্রদায়ের কিছু লোক কক্সবাজার ও পটুয়াখালীর খেপুপাড়ায় বসবাস করে। তাছাড়া সিলেট জেলার খাসীয়া–জৈন্তিয়া পাহাড় সংলগ্ন সীমান্তবর্তী অঞ্চলে খাসীয়া, মনিপুরী ও পাঙোন; ময়মনসিংহের গারো পাহাড় সংলগ্ন হালুয়াঘাট, শ্রীবর্দী, কলমাকান্দা প্রভৃতি অঞ্চলে এবং টাংগাইল জেলার মধুপুরের বিস্তৃত অরণ্য অঞ্চলে গারো, হাজং, হদি, দালুই, পালিয়া, বোনা এবং রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া ও রাজশাহীর বিস্তীর্ণ সমতল ভূমিতে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করছে ওরাও, সাঁওতাল, রাজবংশী, হো, মুন্ডা, পালিয়া ও বোনা উপজাতীয় জনগোষ্ঠী।[১]

এইসব উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর জীবন–ধারা, বিচিত্র খাতে প্রবাহিত এবং নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে বিভক্ত। এই সব উপজাতীয় জনগোষ্ঠী দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের মধ্যে স্থায়ীভাবে বসবাস করলেও বাঙালী জনজীবন হতে তারা বিভিন্ন দিক থেকে বিচ্ছিন্ন। তবে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় ব্যতীত অন্যান্য অঞ্চলে বসবাসরত উপজাতীয়রা রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত নয় এবং তারা এতোই অসচেতন, বিক্ষিপ্ত ও নগণ্য যে তাদের পক্ষে রাজনৈতিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া ও তাদের দ্বারা রাষ্ট্রীয় সংহতি বিপন্ন হওয়ার কোন বাস্তব সম্ভাবনা নেই। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী উপজাতীয়রা যদিও ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি ও জীবন–ধারায় অভ্যস্ত তবে দীর্ঘদিন একই অঞ্চলে পাশাপাশি বসবাস করার মধ্য দিয়ে তাদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বা সংহতি গড়ে উঠেছে। অধিকন্তু, অঞ্চলগত বিবেচনায় তারা নগণ্যও নয়। উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলায় লোকসংখ্যা ৭ লাখ ৯০ হাজার ৪১৪ জন। তার মধ্যে ৩ লাখ ১১ হাজার ২৬৭ জন অ–উপজাতীয় এবং অবশিষ্ট ৪ লাখ ৭৯ হাজার ১৪৭ জন উপজাতীয়।[২] অর্থাৎ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে

উপজাতীয়রাই জনসংখ্যার সংখ্যাগুরু অংশ। সঙ্গত কারণেই পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের উত্থাপিত রাজনৈতিক দাবী বা তাদের রাজনৈতিক ভূমিকা বাংলাদেশের অঞ্চলগত অখন্ডতার বিষয়কে গভীরভাবে প্রভাবিত করে

পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী উপজাতীয় জনগোষ্ঠী যদিও এ অঞ্চলের আদিবাসী নয়; কিন্তু শত শত বৎসর ধরে তারা এ অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী মোট ১৩টি উপজাতির মধ্যে চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা এই তিনটি উপজাতিই প্রধান। উপজাতীয়দের মধ্যেকার জনসংখ্যা বন্টনের দিক থেকে দেখা যায়, চাকমাদের সংখ্যা ২ লাখ ৪১ হাজার ৬১৬, মারমা ১ লাখ ৩১ হাজার ২৩০ এবং ত্রিপুরা ৫৮ হাজার ৪৫৫ জন। অন্যদের মধ্যে মুরং ১৭ হাজার ১৬৮, তেংচ্যাঙ্গা ১৬ হাজার ১৪০, বৌম ৫ হাজার ৫৪৮, রিয়াং ২ হাজার ৪৩৪, পাংখু ১ হাজার ৬৬৮, খুমি ১ হাজার ৯১, খায়াং ১ হাজার ৩২৮, স্রো ৯৬৬, চাক ৭৯৮ ও লুসাই ৬৬৯ জন।[৩]

পার্বত্য চট্টগ্রামের এইসব উপজাতীয় জনগোষ্ঠী জেলার বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে। তবে তিনটি জেলার ছয়টি উপজেলাতেই মোট ৮৯,০৬০টি উপজাতীয় পরিবার বসবাস করে। এর মধ্যে বান্দরবানে ১১,৮৯৯, কাপ্তাইয়ে ৬,৮৭৮, খাগড়াছড়িতে ২১,১৮৮, লামায় ৫২,৯০, রামগড়ে ১১,৯৮৩ এবং রাঙ্গামাটিতে বাস করে ২৩,৮২২ টি উপজাতীয় পরিবার।[৪]

পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী বিভিন্ন উপজাতীয় জনগোষ্ঠীকে এক কথায় 'পাহাড়িয়া' বলে অভিহিত করা হয়। এই পাহাড়িয়াদের আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়। সোফার[৫] এদেরকে 'টিলাবাসী পাহাড়িয়া' ও 'তীরবাসী পাহাড়িয়া' এবং হান্টার[৬] তাদেরকে যথাক্রমে 'পাহাড়ী উপজাতি' এবং 'উপত্যকাবাসী উপজাতি' হিসেবে বিভক্ত করেছেন। পাহাড়ী উপজাতির অন্তর্ভুক্ত গোষ্ঠীগুলো হলো যথাক্রমে লুসাই, পানখুয়া, বৌম, স্রো ও খুমী এবং উপত্যকাবাসী উপজাতীয়রা হলো চাকমা, তেংচ্যাঙ্গা, রিয়াং, খিয়াং, চাক ও মুরং গোষ্ঠীভুক্ত।

বসত এলাকাকে কেন্দ্র করে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দেরকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হলেও ভাষা ও সংস্কৃতির বৈসাদৃশ্যের বিবেচনায় প্রত্যেকটি উপজাতিই আবার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের অধিকারী। লক্ষণীয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যেকটি উপজাতি তাদের নিজস্ব ভাষায় (dialect) কথা বলে। চাকমাদের ভাষা বাংলা, পালি এবং সংস্কৃতের মিশ্রণে একটি নিজস্ব রূপ লাভ করেছে। মারমারা আরাকানী এবং ত্রিপুরারা তাদের নিজস্ব ভাষায় কথা বলে। অন্যান্য উপজাতি আসামী ও বর্মী ভাষা হতে উদ্ভূত একটি মিশ্র ভাষা ব্যবহার করে। সোফারের মতে, অধিকাংশ উপজাতীয় গোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা রয়েছে যা তিব্বতীয়–বর্মী (Tibetan-Burmese) ভাষার শ্রেণীতে পড়ে। কিন্তু সকল উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর ভাষার লিখিত রূপ নেই। তবে বর্মী ভাষার অনুকরণে

চাকমাদের লিখিত ভাষার লুপ্ত প্রায় অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ট্রাইবাল একাডেমীর গবেষকগণ ব্যতীত শিক্ষিত চাকমারাও এই ভাষার লিখিত রূপ সম্পর্কে জ্ঞাত নন। এ থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, উপজাতীয়দের ভাষা মূলতই dialect; যা দিয়ে ভাবের আদান-প্রদান করা যায়, কিন্তু তা কোন অর্থেই প্রতিষ্ঠিত Language নয়, যার সাহায্যে উন্নত ও আধুনিক সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারে। উল্লেখ্য যে, নিজস্ব লিপির চর্চা না থাকার কারণে চাকমা-সাহিত্য বাংলা বর্ণমালা দিয়ে লিখিত হচ্ছে। বাংলা বর্ণমালায় লিখিত চাকমা ভাষার একটি কবিতার কয়েটি লাইন এ প্রসঙ্গে তুলে ধরা হলোঃ

"আর এক্কা দেরী গরি এদে
ম আজাগান পুরেই দিদে
ফুল মালা দি দুঙ তরে।"

ভাষাগত বৈসাদৃশ্য ছাড়াও উপজাতীয়দের ধর্ম বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বিভিন্নতা রয়েছে। চাকমা, মারমা, চাক, খিয়াং ও তেংচ্যাঙ্গা প্রভৃতি উপজাতীয়রা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী; ত্রিপুরা ও রিয়াং উপজাতীয়রা হিন্দু ধর্মাবলম্বী, লুসাই, পাংখু ও বনজোগী উপজাতীয়রা খ্রীষ্টান এবং অন্যান্য উপজাতীয় জনগোষ্ঠী সর্বপ্রাণবাদী বা animist।[৭] তবে বসত এলাকা, ভাষা ও ধর্মগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের সাংস্কৃতিক ও জীবন-যাপন প্রণালীর ক্ষেত্রে অভিন্নতার সূত্রও লক্ষ্য করা যায়। গোষ্ঠী নির্বিশেষে তাদের মধ্যে যেসব সাদৃশ্য রয়েছে তা হলো ঃ (১) তারা সকলেই মঙ্গোলীয় মানবগোষ্ঠীর অর্ন্তভুক্ত, (২) পাহাড় ও অরণ্যে বসবাসে অভ্যস্ত, এবং (৩) অভিন্ন উৎপাদন ব্যবস্থার ধারক অথবা উত্তরাধিকারী।

বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় জনগণের জীবিকা নির্বাহের প্রধান অবলম্বন এখনো জুম চাষ। অর্থাৎ জুম চাষের মতো প্রাচীন কৃষি উৎপাদন প্রণালী পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের মধ্যে এখনও প্রধান উৎপাদন ব্যবস্থা হিসেবে টিকে রয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত দক্ষিণ-পূর্ব বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলে জুম চাষ বা পালাক্রম চাষই ছিলো একমাত্র কৃষি ব্যবস্থা ।[৮] ঐসময় পার্বত্যবাসীদের মধ্যে প্রায় সকলেই এই পালাক্রম কৃষির উপর নির্ভরশীল ছিলো। পরবর্তীকালে সেখানে ধীরে ধীরে পালাক্রম চাষের পাশাপাশি হাল-কৃষি বা লাঙল-কৃষি প্রবর্তিত হতে থাকে। এতদসত্ত্বেও পালাক্রম চাষে পার্বত্যবাসীদের আগ্রহে খুব একটা ভাটাপড়েনি।[৯] কেননা জুম চাষ তাদের পৈত্রিক পেশা এবং এই চাষ পদ্ধতিতেই তারা ঐতিহ্যগতভাবে অভ্যস্ত। এছাড়া, এ অঞ্চলের ভূমি, বনজ সম্পদ ও প্রাকৃতিক অবস্থার বিবেচনায় উপজাতীয়রা পালাক্রম চাষকেই বেশী সুবিধাজনক মনে করেন।

বর্তমানে জুম চাষ বা পালাক্রম চাষের সাথে সংযুক্ত উপজাতীয়দের পূর্বেকার অবস্থান অনেকটা পরিবর্তিত হয়েছে। হাল-কৃষির পর্যায়ক্রমিক প্রসার এবং পার্বত্য ভূমির

বিকল্প ব্যবহারের লক্ষ্যে রাবার চাষ, ফল চাষ ও কাঠের গাছ চাষে সরকারী উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতার ফলে পালাক্রম চাষের উপর নির্ভরতার মাত্রা অনেকটা কমে গেছে। পরিবর্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলের চাষ ব্যবস্থার আলোকে উপজাতীয় জনগণকে চারভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।[১০]

যেমন–

১। পালাক্রম চাষের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল পার্বত্যবাসী,

২। প্রধানত পালাক্রম চাষের উপর নির্ভরশীল পার্বত্যবাসী,

৩। প্রধানত হাল–কৃষি এবং উদ্যান চাষের উপর নির্ভরশীল পার্বত্যবাসী, এবং

৪। হাল–কৃষি ও উদ্যান চাষের উপর প্রায় সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল পার্বত্যবাসী।

তিন

ভৌগোলিক দিক থেকে বাংলাদেশের দক্ষিণ–পূর্বে অবস্থিত পার্বত্য এলাকার আয়তন ৫০৮৯ বর্গমাইল – যা সমগ্র বাংলাদেশের প্রায় এক দশমাংশ। পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তরে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের নিম্ন পর্বতশ্রেণী, দক্ষিণে বার্মার আকিয়াব জেলার পার্বত্য এলাকা, পূর্বে ভারতের লুসাই পাহাড় ও বার্মার আরাকান পর্বতমালা এবং পশ্চিমে চট্টগ্রামের উপকূলীয় সমতল ভূমি। অবস্থানগত দিক দিয়ে এ জেলা ভারত ও বার্মার পার্বত্য এলাকার সাথে সম্পৃক্ত।[১১]

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলটি সব দিক দিয়েই বাংলাদেশের অপরাপর অংশ থেকে ভিন্নতর। বাংলাদেশের মোট আয়তনের অধিকাংশই যেখানে পলিজ সমতল ভূমি, সেখানে পার্বত্য চট্টগ্রাম শিলাভূমি, গিরিখাত এবং দক্ষিণ থেকে উত্তর–পশ্চিমাভিসারী পাহাড়শ্রেণী নিয়ে গঠিত।[১২] শুধু ভূ–প্রকৃতিগত দিক থেকেই নয়; দৈহিক গঠন, ভাষা–সংস্কৃতি, সামাজিক যোগাযোগ এবং এমন কি চাষ পদ্ধতির দিক দিয়েও বাংলাদেশের অপরাপর অংশ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর ভিন্নতা সুস্পষ্ট।

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়রা যেখানে মঙ্গোলীয় মানবগোষ্ঠীভুক্ত, সেখানে বাঙালীরা বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর একটি শঙ্কর রূপ। ওরা যেখানে প্রধানত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী,

বাঙালীরা সেখানে প্রধানত (শতকরা ৮৬৬ ভাগ) ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী। ওদের ভাষার প্রতিষ্ঠিত লিখিত রূপ নেই এবং বিভিন্ন ভাষার মিশ্রণে যাদের কথ্য ভাষার অস্তিত্ব, সেখানে বাঙালীরা প্রতিষ্ঠিত লিখিত ভাষা এবং উন্নত সাহিত্যের অধিকারী। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপাজাতীয়দের চাষ প্রণালীতে যেখানে এখনো পালাক্রম চাষের প্রাধান্য, সেখানে বাঙালীরা হাল-কৃষিতে অভ্যস্ত। এছাড়া জীবিকার অন্যান্য উৎস, সামাজিক অনুষ্ঠান, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের অপরাপর অংশের জনসাধারণ থেকে উপজাতীয়দের সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। মূল কথা হলো, বাংলাদেশের শতকরা ৯৯ ভাগ মানুষ যেখানে বাঙালী, পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়রা সেখানে বাঙালী নয় – ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের জনগোষ্ঠী। বাঙালীরা যেখানে একটি প্রতিষ্ঠিত জাতি, ওরা সেখানে একেকটি উপজাতি।

চার

বাংলাদেশের মূল জনজীবন থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন এইসব উপজাতীয়রা কয়েকশ বৎসর ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি এলাকায় প্রায় সার্বভৌম জাতি হিসেবে বসবাস করে আসছিল এবং সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা দুজন উপজাতি প্রধান, যথা চাকমা ও বোমং কর্তৃক শাসিত হতো। উপর্জাতীয় গ্রাম প্রধানগণ শাসনকার্যে তাদের সহায়তা করতেন। ১৮৬০ সালে বৃটিশ ঔপনিবেশিক সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামকে চট্টগ্রাম জেলা থেকে বিভক্ত করে পৃথক জেলায় পরিণত করে এবং গভর্ণর জেনারেলের একজন প্রতিনিধির মাধ্যমে এই জেলার শাসনকার্য পরিচালনা করা হতো। তবে এই প্রতিনিধির ভূমিকা ছিল একজন তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকার মতো। মূলত উপজাতীয় প্রধানগণই রাজস্ব আদায় এবং বিচারকার্য সমাধা করতেন। অধিকন্তু, বৃটিশ সরকার উপজাতীয়দের ব্যাপারে সরকারী প্রশাসনের হস্তক্ষেপ নিয়ন্ত্রণের জন্যে কতিপয় বিধি ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছিল। এর ফলে বাস্তবে উপজাতি প্রধান ও গ্রাম প্রধানগণই প্রকৃত শাসক থেকে যান। কিন্তু ১৮৬০ সালে বৃটিশ ঔপনিবেশিক সরকার কর্তৃক পাহাড়ী উপজাতীয়দের জন্যে তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগের মাধ্যমে বাইরের সরকারের কর্তৃত্ব এতদঞ্চলে প্রসারিত হয়।[১৩] ১৯০০ সালে বৃটিশ সরকার কর্তৃক উপজাতীয় অঞ্চলের প্রশাসনিক পুনর্গঠনের জন্য ঘোষিত হয় *পার্বত্য চট্টগ্রাম ম্যানুয়েল*। এই *ম্যানুয়েল* প্রবর্তন করে বৃটিশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি পৃথক শাসিত অঞ্চলে পরিণত করে। এই ম্যানুয়েলের বিধি অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রাম তিনটি সার্কেলে বিভক্ত হয়, যেমন – চাকমা, বোমং ও মং সার্কেল। এদের সদর দফতর যথাক্রমে রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও রামগড়ে স্থাপিত হয়। এসব সার্কেলের প্রধান ছিলেন ঐসব অঞ্চলের উপজাতি প্রধান বা রাজা। সার্কেলের রাজস্ব আদায় ও অভ্যন্তরীণ বিষয়াবলী ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট উপজাতি প্রধানগণের উপর অর্পণ করা হয়। তিনটি সার্কেলের ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাকে তিনটি মহকুমায় বিভক্ত করে সাধারণ

প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করা হলেও প্রকৃতপক্ষে রাজা ও গোত্রপতিরা স্থানীয় ও উপজাতীয় প্রথানুসারে উপজাতীয়দের শাসন করতো এবং তারা তাতে সন্তুষ্ট ছিল।

উপজাতীয় প্রশাসন মূলত তিনটি স্তরে বিভক্ত ছিল, যেমন – সার্কেল, মৌজা ও পাড়া। প্রত্যেক স্তরের উপজাতীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় উপনিবেশিক আমলের জেলা প্রশাসন কাজ করতো। *পার্বত্য চট্টগ্রাম ম্যানুয়েলে* এই অঞ্চলে বসতি স্থাপনের বিধান ও পদ্ধতিরও সুস্পষ্ট উল্লেখ ছিল। ম্যানুয়েলের বিধান অনুযায়ী, স্থানীয় হেডম্যান ও গোত্রপতির সুপারিশসহ জেলা প্রশাসকের পূর্ব অনুমতি সাপেক্ষেই কোন ব্যক্তি পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন করতে পারতো। ১৯২০ সালে *পার্বত্য চট্টগ্রাম ম্যানুয়েল* সংশোধিত হয় এবং সংশোধিত ম্যানুয়েলে পার্বত্য চট্টগ্রামকে ''বহির্ভূত এলাকা" ঘোষণা করে সাধারণ প্রশাসন থেকে আলাদা করে স্বাধীন সত্তা প্রদান করা হয়। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে পার্বত্য চট্টগ্রামকে ''সম্পূর্ণরূপে বহির্ভূত এলাকা" হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল।

১৯৪৭ সালে দ্বিজাতি–তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে ভারতের মুসলিম অধ্যুষিত ভিন্ন বৈশিষ্টের দুইটি এলাকা নিয়ে যে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হল সেখানে ৯৫ ভাগ অ–মুসলিম অধ্যুষিত এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে বিসদৃশ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলটিকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়; যদিও পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ ভারতীয় ইউনিয়নে যোগাদানেরই পক্ষপাতি ছিলেন। তিনজন উপজাতীয় প্রধান পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি ``native state" হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের জন্যে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের প্রতি দাবী জানিয়েছিলেন। এসব দাবী বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়ে তারা ত্রিপুরা, কুচবিহার ও খাসীয়া সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে একটি কনফেডারেশন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু এসব প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং ১৯৪৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্তানের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়।[১৪]

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ মর্যাদা *পার্বত্য চট্টগ্রামম্যানুয়েল* অনুসারে অক্ষুন্ন রাখা হয় এবং ১৯৫৬ ও ১৯৬২ সালের সংবিধানেও এ অঞ্চলকে 'বহির্ভূত এলাকা' হিসেবে গণ্য করা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৬৩ সালে সংবিধানের এক সংশোধনীর মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিশেষ মর্যাদা রহিত করা হল। ১৯৬৪ সালে মৌলিক গণতন্ত্র এবং স্থানীয় সরকার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উপজাতীয় জনগণকে প্রথমবারের মতো জাতীয় রাজনৈতিক অঙ্গনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই পর্যায়ে বিভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত উপজাতীয় কর্মচারীদের অন্যান্য জেলায় বদলি করা হয়, বিভিন্ন উপজাতীয়দের দ্বারা গঠিত পুলিশবাহিনী ভেঙে দেয়া হয় এবং পূর্বে উপজাতিগণ কর্তৃক পরিচালিত জেলা প্রশাসনের শাখাসমূহকে কেন্দ্রীয় প্রশাসনের আয়ত্তে আনা হয়। এইভাবে ১৯০০ সালের আইন কর্তৃক প্রদত্ত এবং বৃটিশ সরকার কর্তৃক বলবৎকৃত পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ মর্যাদার অবসান ঘটে।

পাঁচ

পাকিস্তান সরকার কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিশেষ মর্যাদার অবসান এবং উপজাতীয় প্রশাসনের অবলুপ্তি ঘটানো হলেও পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে উপজাতীয়দের অস্তিত্বের প্রশ্নটি রাজনৈতিকভাবে কখনও নিঃশেষ হযে যায়নি। কেননা ধর্মের ভিত্তিতে সৃষ্ট পাকিস্তান মূলত একটি বহুজাতিক রাষ্ট্রের রূপ পরিগ্রহ করেছিল। বাঙালী, পাঞ্জাবী, সিন্ধি, বালুচী, পাখতুন এবং বিভিন্ন উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে উপজাতীয় জনগণ স্বতন্ত্র সত্তা অনুভব করতে পারতো। কিন্তু বাঙালী জাতীয়তাবাদের প্রবল স্রোতে তাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার ব্যাপারটি মারাত্মক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। কারণ বাংলাদেশের জনসংখ্যার মধ্যে মাত্র শতকরা ১·৩ ভাগ হচ্ছে উপজাতীয় এবং তার মধ্যে আবার শতকরা ০·৪২ ভাগ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে বসবাস করে। অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার শতকরা ১·৩ ভাগ উপজাতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে শতকরা ৫৮ ভাগ উপজাতীয় পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বাসিন্দা। এই সংখ্যা বাংলাদেশের বাঙালী জনসংখ্যার তুলনায় এতোই নগণ্য যে এদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব টিকে থাকা বা টিকিয়ে রাখা সত্যিই কঠিন। এই বাস্তব পরিস্থিতির বিবেচনা থেকেই উপজাতীয়দের একটি অংশ বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কাজ করে বলে ধারণা করা যায়।

অধিকন্তু, বাঙালী জাতীয়তার প্রবল প্রতিষ্ঠা এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যেকার একটি অংশের বিরোধিতার প্রতিক্রিয়া হিসেবে স্বাধীনতা–উত্তরকালে বাঙালীদের মধ্যে উপজাতি বিদ্বেষ দেখা দেয়। ১৯৭২ সালের সংবিধানে উপজাতীয়দের স্বতন্ত্র সত্তার স্বীকৃতি না দিয়ে বরং সংবিধানে "বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাঙালী বলে পরিচিত হবেন" বলে উল্লেখ করা হয়। এর ফলে বাঙালী জাতীয়তার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মধ্যে উপজাতীয়দের সাংস্কৃতিক আত্মীকরণের বিষয়টিই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু ভিন্নতর নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় জনগণ বাংলাদেশের ভূখন্ডের মধ্যে তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিচয় নিয়ে বাংলাদেশের নাগরিক থাকতে চেয়েছে, বাঙালী জাতীয়তার মূলধারার সাথে কোন অবস্থাতেই মিলে যেতে চায়নি। এ কারণে, অর্থাৎ একদিকে রাষ্ট্রশক্তি কর্তৃক তাদেরকে বাঙালী জাতীয়তার মধ্যে আত্মীকরণের চেষ্টা এবং অপরদিকে উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক–রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যের দাবি – এ দুয়ের টানাপোড়েন স্বাধীনতা–উত্তর বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সংহতির ক্ষেত্রে এক সংকটের জন্ম দেয়।

ছয়

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্য চেতনা শুধু যে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পটভূমি হতে উৎসারিত তা-ই নয়; এই স্বাতন্ত্র্য-চেতনার নেপথ্যে আর্থ-সামাজিক কারণও অত্যন্ত প্রবল। বিশেষ করে *কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ বাঁধ* নির্মাণ এবং এতদঞ্চলে বহিরাগত বাঙালীদের বসতি স্থাপনকে কেন্দ্র করে উপজাতীয়দের আর্থ-সামাজিক জীবনে যে সমস্যা দেখা দেয় তার ফলে উপজাতীয় জনজীবনে অসন্তোষ দানা বেঁধে ওঠে। ১৯৫৭-১৯৬২ সময়পর্বে তৈরী কাপ্তাই বাঁধ পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় বিশেষ করে চাকমা উপজাতীয়দের জন্যে তাৎক্ষণিক বিপর্যয় বয়ে আনে। কেননা, কাপ্তাই বাঁধের কারণে যে কৃত্রিম হ্রদের সৃষ্টি হয় তার ফলে ১২৫টি মৌজার প্রায় ৪০০ বর্গমাইল এলাকা, যার আওতাভুক্ত ছিল ৫৪,০০০ একর আবাদী জমি (যা জেলার মোট আবাদী জমির শতকরা ৪০ ভাগ), প্লাবিত হয়। এর ফলস্বরূপ ১০,০০০ হালচাষী এবং ৮,০০০ জুম চাষী পরিবারের এক লক্ষেরও অধিক লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।[১৫] পরবর্তীকালে অবশ্য বাঁধের কারণে জমি থেকে উচ্ছেদ হওয়া উপজাতীয়দের তুলনামূলকভাবে নিম্নমানের ২০,০০০ একর আবাদযোগ্য জমিতে পুনর্বাসন করা সম্ভব হয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও ৩৪,০০০ একর আবাদী জমি হতে উপজাতীয়রা বঞ্চিত হয়। ক্ষতিগ্রস্ত মোট ১৮,০০০ পরিবারের মধ্যে ১১,৪৬১টি পরিবারকে কোনভাবে পুনর্বাসিত করা হলেও ৬,২৩৯টি পরিবারের পুনর্বাসনের কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়নি।[১৬] তৎকালীন পুর্ব পাকিস্তান সরকার স্থানচ্যুত জনগণের পুনর্বাসনের জন্য ৫ কোটি ১০ লক্ষ মার্কিন ডলার বরাদ্দ করলেও প্রকৃতপক্ষে কাজটির জন্য ব্যয় করা হয় মাত্র ২ কোটি ২০ লক্ষ ডলার। এ ছাড়াও পুনর্বাসন পরিকল্পনাটি ছিলো ত্রুটিপূর্ণ ও দক্ষতাহীন।[১৭]

১৯৭৯ সালের একটি জরীপ থেকে জানা যায়, চাকমাদের মধ্যে শতকরা ৬৯ ভাগ লোক মনে করে বাঁধটি তাদের জন্য খাদ্য ও অর্থনৈতিক সমস্যা সৃষ্টি করেছে, শতকরা ৮৯ জন মনে করে বাঁধের কারণে বাড়ী ও জমি থেকে তাদেরকে উচ্ছেদ হতে হয়েছে, ৮৭ ভাগ লোক আবাসস্থল পরিবর্তন হেতু নূতন আবাদ তৈরির ক্ষেত্রে প্রচন্ড সমস্যায় নিপতিত হয়েছে, শতকরা ৬৯ ভাগ লোক অভিযোগ করেছে পুনর্বাসনের জন্য প্রদত্ত সরকারী সাহায্য অপর্যাপ্ত, শতকরা ৫৮ ভাগ জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নেই বলে হতাশ হয়েছে এবং শতকরা ৯৩ ভাগের ধারণা হয়েছে যে, বাঁধ নির্মাণের পূর্বে উপজাতীয় জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থা তুলনামূলকভাবে ভাল ছিলো। কাজেই এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই যে, অত্র অঞ্চলে শিল্পজ সমাজের আধিক্যে চাকমারা তিক্ততা প্রকাশ করবে।[১৮]

কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের ফলে সৃষ্ট সংকটের পাশাপাশি বাঙালী জনসাধারণের ব্যাপক হারে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসতি স্থাপন এবং এ ক্ষেত্রে গৃহীত সরকারী নীতি উপজাতীয়দের মধ্যে অসন্তোষের মাত্রা আরো বাড়িয়ে তোলে।

উল্লেখ্য যে, সতের শতকের প্রথমার্ধে সীমিত সংখ্যক বাঙালী বাংলাদেশের অন্যান্য জেলা হতে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে স্থানান্তরিত হয়। ১৮৫০–১৮৬০ সময়কালে চাকমা রাজা ধরম বক্স খান এবং পরবর্তীতে তার উত্তরাধিকারীনী কালিন্দি রাজার ভূমি কর্ষণ ও চাকমাদেরকে নিম্নাঞ্চলের জমি চাষের পদ্ধতি শিখানোর কাজে বাঙালী চাষীদের ডেকে নিয়ে এসেছিলেন। উনিশ শতকে শুধুমাত্র উপজাতি প্রধানগণই জমির মালিকানা লাভ করতে পারতেন এবং সে সময়ে একমাত্র ভাগচাষী হিসেবেই এ অঞ্চলে বাঙালীদের আগমনঘটতো।[১৯] ১৯৪৭ সালের ভারত বিভক্তির সময়েও পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালীদের সংখ্যা ছিলো অত্যন্ত তাৎপর্যহীন অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার মাত্র শতকরা ২ ভাগ। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর হতে এ অঞ্চলে বাঙালী বসতির সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৫৯ সালে বাঙালী বসতির সংখ্যা মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯ ভাগ, ১৯৬১ সালে শতকরা ১২ ভাগ এবং ১৯৮১ সালে শতকরা ৪০ ভাগে উন্নীত হয়।[২০] বর্তমানে রাঙ্গামাটি জেলার বরকল, লংগদু, বান্দরবানের লামা, আলীকদম, নাইখ্যংছড়ি, খাগড়াছড়ির রামগড়, মাটিরাঙ্গা, গুইমারা প্রভৃতি উপজেলায় বহিরাগত বাঙালীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে পড়েছে।[২১] একদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বহিরাগতদের বসতি স্থাপন সংক্রান্ত পূর্বেকার বিধি নিষেধের শিথিলতা এবং সরকারী উদ্যোগে বহিরাগত বাঙালীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে বিপুল সংখ্যক বাঙালী জনসাধারণ স্বাধীনতা–উত্তরকালে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস করতে শুরু করে। অপরদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী বাঙালীদের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার উপজাতীয়দের মধ্যেকার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়ে অধিক বলে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বাঙালী জনসংখ্যা তুলনামূলকভাবে অধিক সংখ্যায় বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য যে, ১৯৫১ থেকে ১৯৭৪ সময়কালে যেখানে উপজাতীয় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ৭১·৭ ভাগ, সেখানে বাঙালী জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ১২৫·১ ভাগ।[২২] জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই ধারা অক্ষুন্ন থাকলে আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যেই পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বাঙালীদের সংখ্যা উপজাতীয়দের সংখ্যা ছাড়িয়ে যাবে বলে ধরে নেয়া যায়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বাঙালী জনবসতির এই ব্যাপকতা উপজাতীয়দের জন্যে বিপর্যয়কর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। কেননা, বহিরাগত বাঙালীরা এতদঞ্চলে বসতি স্থাপন করার পর হাল কৃষি, উদ্যান চাষ, শিল্প কারখানার চাকুরী, কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য শিকার, দিন মজুরী এবং বিভিন্ন ধরনের ব্যবসার সাথে ব্যাপকভাবে জড়িত হয়ে পড়েছে। পাশাপাশি উপজাতীয় জনসাধারণ সাধারণভাবে এসব সুযোগ হতে বঞ্চিত হচ্ছে এবং তাদের মধ্যে কর্মহীনতার মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। প্রথমত, পরিস্থিতিগত প্রতিকূলতা এবং দ্বিতীয়ত, পেশাগত দক্ষতার অভাবই উপজাতীয় জনসাধারণের কর্মহীনতার কারণ বলে বিবেচিত।[২৩] তবে ইদানীং চাকমা ও মারমা উপজাতীয়দের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ চাকুরী ও ব্যবসায় নিয়োজিত হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সাধারণ উপজাতীয়রা প্রান্তিক পর্যায়েই রয়ে গেছে। উল্লেখ্য যে, কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ও চন্দ্রঘোনা কাগজের মিলে

মাত্র শতকরা ১ ভাগ উপজাতি কাজের সুযোগ লাভ করেছে। এ থেকে এ সত্যই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের শিল্প ও বাণিজ্য অর্থনীতি মূলত বাঙালীদেরই নিয়ন্ত্রণে।

সাত

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান বা বর্তমান বাংলাদেশের অর্থনীতিতে আধুনিকায়ন তথা ধনতন্ত্রের প্রসার সাধনের লক্ষ্যে নগরায়ন ও ক্রমবর্ধিষ্ণু শিল্পজ অর্থনীতির বৃহত্তর স্বার্থে যাটের দশক হতে পার্বত্য চট্টগ্রামের সম্পদ আহরণ শুরু হয়। এ ক্ষেত্রে প্রধানত বনজ সম্পদের শিল্প ও বাণিজ্যিক ব্যবহার এবং জলবিদ্যুৎ সুবিধা কাজে লাগানোই মুখ্য বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়। এর সাথে আবার যুক্ত হয়ে পড়ে বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলের ব্যাপক সংখ্যক উদ্বৃত্ত কৃষকদের শহরমুখী অভিযাত্রা ঠেকানোর লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে কাজে লাগানোর প্রচেষ্টা। এর ফলে 'সুষম উন্নয়ন' প্রয়াসের পরিবর্তে কেন্দ্র–প্রান্ত সম্পর্কের আলোকে অঞ্চলগত বৈষম্যই এক্ষেত্রে ঘণীভূত হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার পরিণতি স্বরূপ উপজাতীয় জনগণের সরল ও আত্মনির্ভর সামাজিক–অর্থনৈতিক জীবন প্রচন্ডভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়। উপজাতীয় জনগোষ্ঠী এই ভেবে শঙ্কিত হয়ে পড়ে যে, নূতন অর্থনৈতিক ও পুনর্বাসনের সরকারী নীতি তাদের উপজাতীয় স্বাতন্ত্র্য, স্বকীয়তা এবং সাংস্কৃতিক অস্তিত্বকে অবলুপ্ত করে ফেলবে। এই মানসিক প্রেক্ষাপট থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় গোষ্ঠীসমূহ ধীরে ধীরে প্রতিরোধ আন্দোলনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। উপজাতীয়দের অধিকার রক্ষার উদ্দেশ্যে ১৯৬৬ সালে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম কল্যাণ পরিষদ' নামে একটি গুপ্ত রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হয়। তৎকালীন পাকিস্তান সরকার এই প্রতিরোধ আন্দোলনকে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের উস্কানীতে কম্যুনিষ্ট অনুপ্রাণিত গেরিলা যুদ্ধ হিসেবে গণ্য করে এবং ক্রমবর্ধমান দমননীতি চালিয়ে যেতে থাকে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা প্রাপ্তির সাথে সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের এই সংকটাবস্থাকে বাংলাদেশ উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে, উপরন্তু এই সংকট ক্রমাগত অবনতির দিকে যেতে থাকে।[২৪]

আট

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে কিছু সংখ্যক উপজাতীয় যুবক অংশগ্রহণ করা সত্ত্বেও মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানীদের সহযোগিতা করার অজুহাতে সকল পাহাড়ীদের পাকিস্তানের সহযোগী দালাল হিসেবে চিহ্নিত করে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর কিছু সংখ্যক সশস্ত্র বাঙালী যুবক সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রাম জুড়ে এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধারা পানছড়িতে ১৬ জন উপজাতীয়কে হত্যা করে এবং

দিঘীনালা ও বরকল এলাকাতে নির্যাতনমূলক ঘটনা সংঘটিত হয়।[২৫] অথচ তৎকালীন সরকার এসব ঘটনায় নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। অধিকন্তু, সরকার কর্তৃক মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী বা পাকিস্তানীদের সহযোগিতাকারীদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হলেও রক্ষী বাহিনীর সদস্যরা পাক বাহিনীকে সহায়তাকারী উপজাতীয়দের খুঁজে বের করা ও অস্ত্র উদ্ধার করার অজুহাতে কিছু সংখ্যক উপজাতীয় গ্রামে ত্রাসের সৃষ্টি করে। স্বাধীনতা–উত্তরকালে উপজাতীয়দের উপর এই নির্মম অত্যাচারের প্রতিবাদে তৎকালীন সংসদ সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ণ লার্মার নেতৃত্বে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি' নামে একটি রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী মানবেন্দ্র লার্মার নেতৃত্বে একটি উপজাতীয় প্রতিনিধিদল তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে চার দফা দাবী পেশ করে। দাবীগুলো হচ্ছেঃ (১) পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বায়ত্তশাসন, (২) শরণার্থীদের প্রত্যাহার, (৩) কাপ্তাই বাঁধে ক্ষতিগ্রস্তদের পুর্ণমূল্যায়ন ও পুনর্বাসন, এবং (৪) অনুন্নত পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের জন্য কর্মসূচী গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও তদারকির সর্বময় ক্ষমতা পাহাড়ীদের উপর ন্যস্ত করা। জানা যায়, শেখ মুজিব তাদেরকে উপজাতীয় স্বাতন্ত্র্য পরিহার করে বাঙালী জাতীয়তার সাথে মিশে যাওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।[২৬]

কিন্তু এতে উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ ভীষণভাবে অসন্তুষ্ট হন। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ গণ পরিষদের এক অধিবেশনে মানবেন্দ্র নারায়ণ লার্মা খসড়া সংবিধানের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও জাতিসত্তার স্বীকৃতি দাবী করেন।[২৭] কিন্তু এর কিছুদিন পর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান রাঙ্গামাটি গিয়ে এক জনসভায় 'এখন আমরা সবাই বাঙালী' বলে ঘোষণা দেন। এই ঘোষণার সাথে সাথে শিক্ষিত পাহাড়ীগণ প্রতিবাদ মুখরিত হয়ে ওঠে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তৎকালীন সরকার উপজাতীয়দের দাবী ও প্রতিবাদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। অধিকন্তু, ব্যাপক সংখ্যক বাঙালী জনসাধারণকে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসিত করা হয় এবং উপজাতীয়দের চাষাবাদী জমি জোর করে দখল করে নিয়ে তা বাঙালীদের মাঝে বন্টন করা হয়। অর্থাৎ শেখ মুজিব সরকারের নীতি ছিল উপজাতীয়দের স্বাতন্ত্র্য-হরণ করে বাঙালী জাতীয়তায় মিশে যেতে তাদেরকে বাধ্য করা।[২৮]

নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য ও ঐতিহ্যগত অধিকার হারানোর প্রেক্ষাপটে এবং নিয়মতান্ত্রিক পথে দাবী আদায়ে ব্যর্থ হয়ে উপজাতীয়রা সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে তাদের লক্ষ্য অর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং সে লক্ষ্যেই ১৯৭৩ সালের ৭ই জানুয়ারী জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র শাখা হিসেবে "শান্তি বাহিনী" গঠিত হয়। ১৯৭৩ ও ১৯৭৪ সালে উপজাতীয়দের মধ্যেকার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বহুলোক শান্তি বাহিনীতে নিয়োগ লাভ করে এবং সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য গভীর অরণ্যে একটি মিলিটারী একাডেমীও প্রতিষ্ঠা করা হয়। পুলিস, ই পি আর এবং সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত উপজাতীয় সদস্যরা এ একাডেমী পরিচালনা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের দায়িত্ব গ্রহণ করে। গভীর অরণ্যে চলে যাওয়া রাজাকার

বাহিনীর সদস্যরাও এসে সশস্ত্রভাবে এদের সাথে যোগ দেয়। বিভিন্ন জায়গায় কুড়িয়ে পাওয়া অস্ত্র ও রাজাকারদের অস্ত্রে প্রাথমিক ট্রেনিং চলতে থাকে। অতঃপর ভারতের 'নাগা' ও 'মিজো' বিদ্রোহী এবং বার্মার কমিউনিস্ট বিদ্রোহীদের নিকট থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করা হয়।[২৯] মুজিব সরকার যখন 'দ্বিতীয় বিপ্লব' নিয়ে ব্যস্ত তখন সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে সশস্ত্র 'শান্তি বাহিনী' সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের পট পরিবর্তনের পর শ্রী লারমা আত্মগোপন করেন এবং দীঘিনালায় জনসংহতি সমিতির প্রধান কার্যালয় ও শান্তিবাহিনীর জেনারেল হেড কোয়ার্টার স্থাপন করা হয়। সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামকে ৬টি সেক্টরে, প্রত্যেক সেক্টরকে ৪টি জোনে এবং প্রত্যেক জোনকে কয়েকটি সাব–জোনে বিভক্ত করা হয়। ১৯৭৬ সালের শুরুতেই শান্তিবাহিনীর সামরিক এ্যাকশন কর্মসূচী আরম্ভ হয়ে যায়। প্রথম দিকে কর্মসূচী ছিল থানা বা পুলিশ ফাঁড়ি আক্রমণ করে অস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহ করা এবং পরবর্তীতে ব্রীজ, কালভার্ট, সরকারী সম্পত্তি ধ্বংস করা এবং সুযোগ মতো বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর উপর আক্রমণ করা।[৩০] ১৯৭৬ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ পাঁচ বৎসর পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতি অত্যন্ত সংঘাতময় ছিলো। এই সময়ে শান্তি বাহিনী ও সরকারী বাহিনীর মধ্যে প্রচন্ড সংঘর্ষ ঘটে এবং সরকারী বাহিনী ও শান্তি বাহিনী যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়। ১৯৮০ সালের মার্চের প্রথম ভাগে শান্তি বাহিনীর গেরিলা হামলায় ২২ জন সৈন্য ও ১ জন অফিসার নিহত হবার সাথে সাথে পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটে।[৩১] এই ঘটনার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ১৯৮০ সালের ২৫শে মার্চ বহিরাগত শরণার্থীদের সহযোগে সরকারী বাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামের কমলাপাতি ইউনিয়নের কাউখালী বাজারে আনুমানিক ৩০০ উপজাতীয়কে হত্যা করে।[৩২] এই ঘটনার পর একই বৎসরে বহিরাগত বাঙালীদের দ্বারা উপজাতীয়দের উপর বেশ কয়েকটি আক্রমণ পরিচালিত হয়। যেমন, ১৫ই সেপ্টেম্বর রাইখ্যাবিলিতে, ২৮শে সেপ্টেম্বর বাউরা পাড়ায়, ১৯শে নভেম্বর উপলছড়ি গ্রামে, ২৯শে নভেম্বর লংগদুতে, ১১ই ডিসেম্বর নোয়াপাড়া ও বিধন কার্বারীর গ্রামে এবং ২৩শে ডিসেম্বর দাতবদুপ্যায়।

কাউখালী বাজারের ঘটনার পর দেশের বিরোধী দলগুলোর মধ্যে প্রচন্ড প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং তিনজন বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যের দ্বারা একটি তদন্তকারী কমিটি গঠিত হয়, যার সদস্য ছিলেন যথাক্রমে রাশেদ খান মেনন, শাহজাহান সিরাজ ও উপেন্দ্র লাল চাকমা। উক্ত কমিটি সরকারের কাছে নিম্নলিখিত প্রস্তাব পেশ করেছিলোঃ

(১) বেসামরিক প্রশাসনের স্বার্থে সামরিক বাহিনীর অপারেশন বন্ধ করা,

(২) উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে অবিলম্বে আলোচনা করা এবং কমলাপাতি সহ অন্যান্য ঘটনার তদন্ত, বিচার এবং শ্বেতপত্র প্রকাশ,

(৩) বিভিন্ন জেলা থেকে এ জেলায় শরণার্থীদের পুনর্বাসন বন্ধ করা,

(৪) শরণার্থীদের অনতিবিলম্বে ফিরিয়ে নেয়া,

(৫) নির্যাতিত ও উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন ও বিধ্বস্ত বৌদ্ধ মন্দির পুনর্গঠন, এবং

(৬) বাজারে বেচাকেনার উপর বিধি–নিষেধ প্রত্যাহার করা।

কিন্তু তৎকালীন জিয়াউর রহমান সরকার এসব প্রস্তাব অনুযায়ী কোন পদক্ষেপই গ্রহণ করেনি। বরং জিয়া সরকার মুজিব আমলে স্থাপিত তিন মহকুমার তিনটি সেনানিবাসকে অত্যাধুনিকভাবে সম্প্রসারিত করে এবং পূর্ণ সামরিক শক্তি দিয়ে বিদ্রোহীদের দমন করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে সামরিক বাহিনী সফলতা অর্জন করতে পারলেও সর্বক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করতে পারেনি।

জিয়া সরকার দমনমূলক তৎপরতার পাশাপাশি পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে দুইটি কৌশলগত পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এর একটা হলো *পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড* গঠন এবং অপরটি হলো উপজাতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সহযোগিতা ও সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে এবং জনসংহতি সমিতির বিকল্প হিসেবে *ট্রাইবাল কনভেনশন* নামে একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। কিন্তু ট্রাইবাল কনভেনশন ইপ্সিত ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয় এবং 'উন্নয়ন পরিকল্পনা' সম্পর্কে পাহাড়ী উপজাতীয়দের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এই প্রেক্ষাপটে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে ১৯৮০ সালের শেষের দিকে উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে এক বৈঠকে মিলিত হন। কিন্তু আলোচনায় কিছুটা অগ্রগতি সাধিত হলেও তার অস্বাভাবিক মৃত্যুর ফলে সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। পরবর্তী সাত্তার সরকারের আমলে সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে কোন অগ্রগতি তো হয়নিই, বরং সমস্যার জটিলতা বৃদ্ধি হতে থাকে।৩৩

নয়

এরশাদ সরকার ক্ষমতায় আসার পর উপজাতীয়দের আর্থ–সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে বিশেষ ব্যবস্থা ঘোষণা করে এবং *পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডকে* সক্রিয় করে তোলা হয়। ১৯৮৪ সালে এই এলাকার উন্নয়নের জন্যে একটি বিশেষ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ১৯৯০ সাল নাগাদ মোট ১৯টি প্রকল্পের জন্যে ২৬০ কোটি টাকারও অধিক অর্থ পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ করা হয়। মোট অর্থের অধিকাংশই

বরাদ্দ করা হয়েছে সড়ক ও টেলিযোগাযোগ এবং সমন্বিত বনায়ন ও ঝুমিয়া পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচীর পাশাপাশি এরশাদ সরকার সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে কতিপয় রাজনৈতিক সিদ্ধান্তও গ্রহণ করে। এসব সিদ্ধান্তের মধ্যে যে দুটি সিদ্ধান্ত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ তা হলোঃ শান্তিবাহিনীর সদস্যদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা ও তাদের পুনর্বাসনের আশ্বাস এবং জনসংহতি সমিতির সাথে আনুষ্ঠানিক আলোচনার উদ্যোগ গ্রহণ। এরশাদ সরকারের এই দুইটি সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে শান্তিবাহিনীর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সদস্য (প্রধানত প্রীতি গ্রুপ) অস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ করে এবং জনসংহতি সমিতির রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে সরকারের ছয় দফা আনুষ্ঠানিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও শান্তি বাহিনীর সাথে বাংলাদেশ সরকার ও পুনর্বাসিত বাঙালী জনসাধারণের বিরোধ ও সংঘাত থেমে যায়নি। ১৯৮০ সাল থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন ঘটনায় শান্তিবাহিনী কর্তৃক ৭৫৬ জন বাঙালী ও ১১৬ জন উপজাতি নিহত হয়েছে এবং আহত হয়েছে ৪৪৭ জন বাঙালী এবং ৭১ জন উপজাতি।[৩৪] পাশাপাশি বাঙালী বসতি স্থাপনকারীরা সরকারী বাহিনীর সহযোগিতায় ১৯৮৩ সালে বরকলে, ১৯৮৬ সালে বসাচতর, মাটিরাঙ্গা, রামগড়, পানছড়ি ও দীঘিনালাতে, ১৯৮৮ সালে মারিশ্যাতে এবং ১৯৮৯ সালের ৪ঠা মে লংগদুতে উপজাতীয়দের উপর আক্রমণ চালিয়েছে বলে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের এক প্রচারপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

সংঘাতপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত ১৯৮৭ সালের ৭ই ডিসেম্বর উভয় পক্ষের (সরকার ও জনসংহতি সমিতি) আনুষ্ঠানিক দ্বিতীয় বৈঠকে জনসংহতি সমিতি সরকারের কাছে পাঁচ দফা দাবীনামা পেশ করে। দাবীগুলি নিম্নরূপঃ

(১) নিজস্ব আইন পরিষদ সম্বলিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে প্রাদেশিক* মর্যাদা প্রদান, দেশরক্ষা, বৈদেশিক, মুদ্রা ও ভারী শিল্প ব্যতীত পার্বত্য চট্টগ্রামের সাধারণ প্রশাসন, পুলিশ, বিচার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, ক্ষুদ্র শিল্প, অর্থ, যোগাযোগ ও পরিবহণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রাদেশিক সরকারকে প্রত্যক্ষ প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রদান করা, কেন্দ্র ও প্রদেশের ক্ষমতা স্বতন্ত্রভাবে তালিকাভুক্ত করা, পার্বত্য চট্টগ্রামের নাম পরিবর্তন করে পার্বত্য চট্টগ্রামকে 'জুমল্যান্ড' নামে পরিচিত করা এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিবর্তন করা।

---

* সরকারের সাথে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ বৈঠকে জনসংহতি সমিতি প্রাদেশিক মর্যাদার দাবী পরিবর্তন করে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী উত্থাপন করে।

(২) গণভোটের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় জনগণের সম্মতি না নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে কোন প্রকার শাসনতান্ত্রিক সংশোধন ও পরিবর্তন না করা ও দেশের অপরাপর অংশের কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে জরুরী আইন অথবা সামরিক আইন যাতে জারী করা না হয় সে রকম শাসনতান্ত্রিক সংবিধি–ব্যবস্থা প্রণয়ন করা এবং কেউ যাতে বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল হতে এসে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন, ভূমি ক্রয়, বন্দোবস্তি করতে ও বিনানুমতিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ করতে না পারে তার জন্যে শাসনতান্ত্রিক সংবিধি–ব্যবস্থা প্রণয়ন করা।

(৩) ১৯৪৭ সাল হতে এ পর্যন্ত এবং বাংলাদেশ সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তিপত্র সম্পাদিত না হওয়া পর্যন্ত যারা পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশ করে পাহাড় কিংবা সমতল ভূমি ক্রয়, বন্দোবস্তি ও বেদখল করে বসতি স্থাপন করেছে ও করতে থাকবে সে সব বহিরাগতকে পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে সরিয়ে নেয়া; পাকিস্তান শাসনামল হতে বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তিপত্র সম্পাদিত না হওয়া পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের যেসব নরনারী ভারত ও বার্মায় চলে যেতে বাধ্য হয়েছে অথবা চলে যেতে বাধ্য হবে তাদের সকলকে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুর্নবাসিত করা, কাপ্তাই বাঁধের জলসীমা ৬০ ফুট নির্ধারিত করা এবং কাপ্তাই বাঁধে ক্ষতিগ্রস্ত উদ্বাস্তুদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কোন সদস্য ও জনসংহতি সমিতির সাথে জড়িত কারো নামে যদি কোন প্রকারের মামলা, অভিযোগ, ওয়ারেন্ট ও হুলিয়া থাকে অথবা কারো অনুপস্থিতিতে কোন বিচার হয়ে থাকলে বিনাশর্তে সেসব মামলা, অভিযোগ, ওয়ারেন্ট ও হুলিয়া প্রত্যাহার ও বিচারের রায় বাতিল করা এবং কারো বিরুদ্ধে কোন প্রকারের আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

(৪) পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের উন্নতিকল্পে কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি খাতে বিশেষ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে তার জন্য কেন্দ্রীয় তহবিল হতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা, পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য একটি নিজস্ব ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা, উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে উপজাতীয়দের জন্য আসন সংরক্ষণ, বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস ও প্রতিরক্ষা বাহিনীতে নির্দিষ্ট কোটা সংরক্ষণ, চাকুরীতে প্রবেশের ক্ষেত্রে বয়সসীমা ও শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল করা।

(৫) পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা শান্তিপুর্ণ ও রাজনৈতিক উপায়ে সমাধানের লক্ষ্যে অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য আটককৃত সকল

> উপজাতীয়দের মুক্তি প্রদান, পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের উপর সকল প্রকারের নির্যাতন –নিপীড়ন বন্ধ করা, যুক্ত গ্রাম ও আদর্শ গ্রামসমূহ ভেঙে দেয়া, বাংলাদেশের অপরাপর অঞ্চল হতে এসে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন বন্ধ করা, বহিরাগতদের পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে অন্যত্র সরিয়ে নেয়া, দীঘিনালা, রুমা ও আলিকদম সেনানিবাস সহ বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সকল ক্যাম্প পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে সরিয়ে নেয়া।[৩৫]

জনসংহতি সমিতি কর্তৃক পাঁচ দফা দাবী সরকারের কাছে পেশ করার পর সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে দ্বিমত দেখা দেয়। কিন্তু তারপরও উভয় পক্ষ ঐকমত্যে পৌঁছার প্রয়াসে আলোচনা অব্যাহত রাখে। কিন্তু ষষ্ঠ বৈঠকে সরকার ও জনসংহতি সমিতির দৃষ্টিভঙ্গীগত পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠলে উভয় পক্ষের পরবর্তী বৈঠক অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় সরকার জনসংহতি সমিতির সাথে আলোচনার পরিবর্তে সমস্যা সমাধানের বিকল্প পন্থা উদ্ভাবনে উদ্যোগী হয়। এ পর্যায়ে সরকার কর্তৃক গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি জনসংহতি সমিতির সাথে জড়িত নয় অথচ উপজাতীয় সমাজে প্রভাবশালী এমন কিছু সংখ্যক উপজাতীয় ব্যক্তিত্বের সাথে আলোচনার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সরকারের কাছে নয় দফা প্রস্তাব পেশ করে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির প্রস্তাবিত নয় দফা রূপরেখাকে আইনগত ভিত্তি প্রদানের জন্যে সরকার ১৯৮৯ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে জাতীয় সংসদে ৪টি বিল উথাপন করে। এই বিলগুলো হচ্ছেঃ *খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ বিল ১৯৮৯, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ বিল ১৯৮৯, বান্দরবান পার্বত্য জেলাসমূহ বিশেষ বিল ১৯৮৯।* সরকার কর্তৃক উথাপিত উক্ত বিলসমূহ ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯ তারিখে জাতীয় সংসদ কর্তৃক পাশ হয়ে আইনে পরিণত হয়। এই আইনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলঃ এর ফলে–

(১) জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে ৩টি নির্ধারিত জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হবে,

(২) একজন উপজাতীয় নাগরিক এই জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবেন,

(৩) পরিষদের সংখ্যানুপাতিক হারে বিভিন্ন উপজাতীয় এবং স্থায়ীভাবে বসবাসকারী অ–উপজাতি নাগরিকদের প্রতিনিধিত্ব থাকবে,

(৪) তিন বছরের জন্যে এই সরকার পরিষদ নির্বাচিত হবে,

(৫) ডেপুটি কমিশনার জেলা সরকার পরিষদের সদস্য–সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন,

(৬) পুলিশের সাব–ইন্সপেক্টরসহ এর নিম্ন পর্যায়ের সকল পদের পুলিশ কর্মচারী নিয়োগ, বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, খাজনা, ট্যাক্স আরোপ ও আদায় এবং স্থানীয় বিধি–বিধান প্রণয়ন ও কার্যকর করার ক্ষমতা প্রতিটি পার্বত্য জেলার থাকবে।[৩৬]

সরকার কর্তৃক প্রণীত এই জেলা পরিষদকে জনসংহতি সমিতি 'গণবিরোধী' ও 'ষড়যন্ত্রমূলক' বলে আখ্যায়িত করেছে। জনসংহতি সমিতির মতে, এই জেলা পরিষদ বিল সমূহে জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব, ভূমি স্বত্বাধিকার ও মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের কোন সুষ্ঠু বিধি–ব্যবস্থা নেই। বরঞ্চ এই জেলা পরিষদ বাস্তবায়িত হলেই জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব বিলুপ্তির পথ আরো ত্বরান্বিত ও নিশ্চিত হয়ে উঠবে।[৩৭] জনসংহতি সমিতির মতে যে সব কারণে জেলা পরিষদ গ্রহণযোগ্য নয়, তা হলো–

(১) এই জেলা পরিষদে বৃটিশ প্রদত্ত ১৯০০ সালের *পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন* বিধি লঙ্ঘন করে ৪ (চার) লক্ষাধিক বেআইনী অনুপ্রবেশকারীদের পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করার আইনানুগ অধিকার দেয়া হয়েছে এবং বেআইনী অনুপ্রবেশকারীদের ভোটাধিকার প্রদান করা হয়েছে।

(২) জুম্ম জনগণের ভূমিস্বত্ব সংরক্ষণের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়নি এবং সংরক্ষিত ও রক্ষিত বনাঞ্চল, কাপ্তাই হ্রদ ও বিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা, বেতবুনিয়া ভূ–উপগ্রহ এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্প–কারখানা এলাকা, সরকার বা জনস্বার্থের প্রয়োজনে হস্তান্তরিত বা বন্দোবস্ত জায়গা–জমি এবং রাষ্ট্রীয় স্বার্থের বরাত দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট আয়তনের ৯০ ভাগ জমি হরণ করা হয়েছে।

(৩) পার্বত্য চট্টগ্রামের সাধারণ প্রশাসনে প্রশাসনিক ক্ষমতা দেয়া হয়নি।

(৪) বেআইনী অনুপ্রবেশ বন্ধ করা হয়নি।

(৫) অগণতান্ত্রিক, প্রতিক্রিয়াশীল ও দুর্বল সামন্ততান্ত্রিক নেতৃত্বকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হযেছে।

(৬) জুম্ম জনগণের সংস্কৃতি, ধর্ম, ভাষা, সামাজিক রীতিনীতি ও সংগঠন, ঐতিহ্য ইত্যাদি সাংবিধানিক উপায়ে সংরক্ষিত হয়নি।

(৭) দশ ভিন্ন ভাষাভাষী জুম্ম জনগণকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে তিন ভাগে ভাগ করে জুম্ম জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বিলুপ্ত করা হয়েছে এবং সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

(৮) জুম্ম জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষিত হতে পারেনি।

(৯) সরকারী আদেশের বিরুদ্ধে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা নেই।

জনসংহতি সমিতি পার্বত্য জেলা পরিষদ তথা নয় দফা রূপরেখার তীব্র বিরোধিতা এবং তাদের দেয়া পাঁচ দফা বাস্তবায়নে সক্রিয় থাকা সত্ত্বেও ১৯৮৯ সালের ২৫শে জুন তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। যদিও এই নির্বাচনে উপজাতীয় জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেনি, তবু জনসংহতি সমিতি বা শান্তি বাহিনীর পক্ষে এই নির্বাচন বানচাল করাও সম্ভব হয়নি। বস্তুত পার্বত্য জেলা পরিষদের এই নির্বাচন পার্বত্য চট্টগ্রাম সংকটের প্রশ্নে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।

দশ

পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা পরিষদ নির্বাচন জনসংহতি সমিতি বা শান্তিবাহিনীর জন্যে নিঃসন্দেহে একটি আপাত রাজনৈতিক বিপর্যয়। কেননা, জেলা পরিষদ নির্বাচনের মাধ্যমে একটি বিকল্প রাজনৈতিক নেতৃত্ব গড়ে উঠেছে এবং তারা তাদের নেতৃত্ব চর্চার একটি প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তিও লাভ করেছে। ফলে পূর্বে যেসব উপজাতীয় সংগঠন বা নেতৃবৃন্দ সরকারের সাথে সহযোগিতামূলক ভূমিকায় অবতীর্ণ হতো, তাদের তুলনায় জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যরা অধিক প্রতিনিধিত্বশীল। অধিকন্তু, জেলা পরিষদ গঠন ও তার মাধ্যমে পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়ন তৎপরতা পরিচালনার মধ্য দিয়ে উপজাতীয়দের মধ্যে একটি সুবিধাভোগী গোষ্ঠী বিকশিত হচ্ছে। এই গোষ্ঠী স্বাভাবিকভাবেই স্বীয় স্বার্থে এই ব্যবস্থার পক্ষে কাজ করেছে এবং করতে থাকবে। ফলে বাংলাদেশের রাষ্ট্রশক্তি ও বাঙালী বসতি স্থাপনকারীদের বিরুদ্ধে এতোদিন উপজাতীয়দের যে রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালিত হয়ে আসছিল তা এখন দুই ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়েছে। জনসংহতি সমিতিকে এখন একদিকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রশক্তি ও বাঙালী বসতি স্থাপনকারী, অপরদিকে একটি শক্তিশালী উপজাতীয় সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হচ্ছে।

ইতোমধ্যে জনসংহতি সমিতি বিভিন্ন উপজাতীয় সংগঠন, যেমন – *পাহাড়ী জনকল্যাণ সমিতি, ট্রাইবাল কনভেনশন, জনকল্যাণ পরিষদ, হেডম্যান এসোশিয়েশন, মার্মা উন্নয়ন সংসদ, ত্রিপুরা উন্নয়ন সংসদ* ইত্যাদি উপজাতীয় সংগঠন এবং জেলা পরিষদ নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে তাদের বক্তব্য প্রকাশ করেছে। এ থেকে মনে হয়, উপজাতীয়দের মধ্যে যে রাজনৈতিক বিভক্তি বর্তমানে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে তার ফলে সরকারের অবস্থানই শক্তিশালী হচ্ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও লক্ষণীয় বাস্তবতা হলো, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার কোন সমাধান হয়নি এবং এ অঞ্চলে স্থায়ী শান্তিও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামে বর্তমানে সংঘাতময় পরিবেশ বিরাজ করছে এবং জনসংহতি সমিতির পক্ষে ব্যাপক সংখ্যক উপজাতীয় জনগণের সমর্থন রয়েছে। একথা সত্য যে, দীর্ঘ দেড় দশক যাবত সশস্ত্র আন্দোলন–সংগ্রামের মাধ্যমে জনসংহতি সমিতি তথা শান্তিবাহিনী আজ পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনীতিতে এক অন্যতম স্থান দখল করে নিয়েছে।[৩৮] তাই জনসংহতি সমিতিকে পাশ কাটিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের চেষ্টা বাস্তবসম্মত নয়। এক তরফা সিদ্ধান্তের ফলে গঠিত জেলা পরিষদ বরং জনসংহতি সমিতির সাথে সরকারের দূরত্ব বাড়িয়ে তুলেছে। যদিও সরকার '... *গুটিকয়েক অস্ত্রধারী চরমপন্থী পার্বত্য চট্টগ্রামের নূতন স্থানীয় শাসনের কাঠামোর সঙ্গে একমত না হলেও কোন ক্ষতি হবেনা*'[৩৯] বলে মনে করেন কিন্তু জনসংহতি সমিতির রাজনৈতিক দৃঢ়তা ও শান্তিবাহিনীর অব্যাহত সশস্ত্র তৎপরতা সরকারের এ ধারণাকে ভ্রান্ত প্রমাণিত করেছে।

এগার

জেলা পরিষদ নির্বাচনের পর তৎকালীন প্রশাসন ভারতে আশ্রয়লাভকারী শরণার্থীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। সে সময়ে সরকারের একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদল উপজাতীয় শরণার্থীদের স্বদেশে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের শরণার্থী শিবিরগুলো পরিদর্শন ও উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনাও করেছেন। উপজাতীয় সমস্যার প্রেক্ষিতে তৎকালীন প্রশাসনের কতিপয় কৌশলগত পদক্ষেপ এবং জনসংহতি সমিতির অভ্যন্তরীণ কোন্দলের (বাম বনাম ডান দ্বন্দ্ব, নবীন বনাম প্রবীণ দ্বন্দ্ব) কারণে ত্রিপুরায় শরণার্থী শিবির হতে উপজাতীয়দের স্বেচ্ছায় স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে শান্তিবাহিনীর সদস্যদের মধ্যে কিছুটা হতাশা দেখা দিয়েছিল।

উল্লেখ্য যে, ১৯৭৮ সালে জনসংহতি সমিতির মধ্যে যে রাজনৈতিক বিতর্কের সূত্রপাত হয় তার ফলে ১৯৮২ সালে জনসংহতি সমিতি দুই ভিন্ন ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। প্রীতি চাকমার নেতৃত্বাধীন অংশ আঞ্চলিক ও জাতিগত প্রশ্নকে প্রাধান্য প্রদান করে স্বল্প সময়ের মধ্যে যুদ্ধ পরিসমাপ্তির কৌশল গ্রহণ করতে চেয়েছিল। কিন্তু মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বাধীন অংশ আঞ্চলিক, জাতিগত ও শ্রেণীগত প্রশ্ন সামনে রেখে

দীর্ঘ সশস্ত্র সংগ্রামের লাইন গ্রহণ করতে আগ্রহ প্রকাশ করে। ফলে এই মতাদর্শিক ও কৌশলগত প্রশ্নে গড়ে ওঠা বিরোধের পরিণতিতে ১৯৮৩ সালের ১০ই নভেম্বর ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের অমরপুর মহকুমার ইজারা গ্রামের কল্যাণপুর ক্যাম্পে প্রীতি গ্রুপের হামলায় মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা নিহত হন।[৪০] লারমার মৃত্যু শান্তিবাহিনীতে চরম বিপর্যয়কর পরিস্থিতি সৃষ্টি করলেও পরবর্তীকালে সরকারের কাছে প্রীতি গ্রুপের অধিকাংশ সশস্ত্র সদস্যের আত্মসমর্পণের ফলে পুনরায় সন্তু লারমার নেতৃত্বে জনসংহতি সমিতি তথা শান্তিবাহিনী সংগঠিত ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। কিন্তু ১৯৭৬ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র তৎপরতা যে ব্যাপকতা লাভ করেছিলো, অভ্যন্তরীণ কোন্দলের ফলে পরবর্তীতে তা অনেকাংশেই স্তিমিত হয়ে পড়ে। এই সুযোগে সরকারী বাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে তাদের ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়। পরবর্তীকালে শান্তি বাহিনীর পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রামের অভ্যন্তরে তাদের পুরনো অবস্থান ও নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি।

বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলটি ৩টি জেলা এবং ২৫টি উপজেলা নিয়ে প্রশাসনিক ভাবে সুগঠিত। বেসামরিক প্রশাসনের পাশাপাশি সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে নিরাপত্তা বাহিনীর ব্যাপক অবস্থানও সুস্পষ্টভাবে লক্ষণীয়। অধিকন্তু, পার্বত্য চট্টগ্রামে যোগাযোগ (সড়ক ও টেলিফোন) ব্যবস্থার ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটেছে। এর ফলে অর্থাৎ প্রশাসনিক ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক সম্প্রসারণের কারণে শান্তিবাহিনী তার কৌশল কিছুটা পরিবর্তন করে ঝটিকা আক্রমণের মাধ্যমে সশস্ত্র তৎপরতা এবং তাদের আন্দোলনের পক্ষে বিশ্বজনমত গড়ে তোলা, বিশেষ করে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ও মঙ্গোলীয় মানবগোষ্ঠী অধ্যুষিত রাষ্ট্রসমূহের রাজনৈতিক সমর্থন আদায়ের চেষ্টা শুরু করেছে। এর ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা একটি নূতন আঙ্গিক লাভ করেছে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, এরশাদ সরকারের পতনের পর গঠিত অন্তরবর্তী সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত নীতির পরিবর্তন এবং বিতর্কিত পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ বাতিল করেনি। নির্বাচিত বিএনপি সরকারও পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের কোন রাজনৈতিক উদ্যোগ অদ্যাবধি গ্রহণ করেনি। ফলে এরশাদের পতনের পরও পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার প্রকৃতিগত পরিবর্তন ঘটেনি। তবে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে নির্বাচিত জাতীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের আওতায় এ সমস্যার একটি স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানে সচেষ্ট রয়েছেন।[৪১]

বার

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার ব্যাপকতা ও গভীরতা নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সংহতির ক্ষেত্রে প্রকট সংকট হিসেবে দেখা দিয়েছে। এই সংকট একদিকে রাষ্ট্রীয় সম্পদের

অনুৎপাদনশীল ব্যবহার (সামরিক/প্রশাসনিক ব্যয়) এবং পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর অত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্নের সাথে সংযুক্ত। ফলে উন্নয়ন ও জাতিগত সমন্বয়ের রাজনৈতিক–অর্থনৈতিক বিবেচনা থেকেই বিষয়টির নিষ্পত্তি প্রয়োজন।

শক্তিশালী বাঙালী জাতীয়তাবাদের মধ্যে দুর্বল জাতিসত্তা সমূহের আত্মীকরণ না ঘটিয়ে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বৃহত্তর জাতির সাথে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপজাতীয় গোষ্ঠীসমূহের স্বার্থগত সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান এবং তার ফলে রাষ্ট্রীয় সংহতি দৃঢ়ভাবে গড়ে উঠতে পারে। যদিও বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে অভিন্ন 'জুম্ম জাতীয়তাবাদ' গড়ে তোলা এবং তার ভিত্তিতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠাই জনসংহতি সমিতির রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রধান অভিব্যক্তি কিন্তু আধুনিককালে উৎপাদন ব্যবস্থার ঐতিহ্যগত অভিন্নতার ভিত্তিতে 'জুম্ম জাতীয়তাবাদ' গড়ে তোলা অত্যন্ত কঠিন। এক্ষেত্রে আবার সরকার এবং বহিরাগত বাঙালীরা বিশেষ করে বাঙালী মুৎসুদ্দী শ্রেণী তাদের স্বীয় রাজনৈতিক ও শ্রেণীগত স্বার্থে বিভিন্ন উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিতে সচেষ্ট রয়েছে। এর সাথে আবার যুক্ত হয়েছে উপজাতীয় সুবিধাভোগীদের স্বার্থগত প্রশ্ন। ফলে একদিকে উপজাতীয়দের মধ্যকার সংহতি রক্ষা, অপরদিকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রশক্তি এবং সুবিধাভোগী বাঙালী ও উপজাতীয়দের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রাম চালানোর ক্ষেত্রে জনসংহতি সমিতি জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে। ফলে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর স্বার্থগত সমন্বয়ের (জাতিসত্তা এবং অর্থনৈতিক) পরিবর্তে আত্মীকরণের ঝোঁকটিই প্রবল হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই অবস্থা জাতিগত নিপীড়নের বিষয়টিকেই প্রতিফলিত করে। এবং দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে এই সংকটের নূতন মাত্রা সংযোজিত হতে পারে। কাজেই আপাত পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে এমন অবস্থা সৃষ্টি করা প্রয়োজন যাতে প্রকৃত অর্থে ঐতিহ্যগত উপজাতীয় স্বায়ত্তশাসন সম্ভবপর হয়। কিন্তু তা না করে সনাতন কায়দায় দলন বা দমনের নীতি কিংবা কৌশলগত সাময়িক সাফল্যের আলোকে সমস্যার সমাধান দেবার আমলাতান্ত্রিক প্রচেষ্টা এই অঞ্চলে শান্তি এবং রাষ্ট্রীয় সংহতি প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে সংকটকে বরং স্থায়ী করবে।

অতএব, দেশের সংখ্যালঘু উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর সাথে সশস্ত্র সংঘাতের পরিবর্তে বাস্তব ভিত্তিক রাজনৈতিক সমঝোতায় পৌছার উপলব্ধিই জাতিগত অধিকার এবং রাষ্ট্রীয় সংহতির সুসমন্বিত ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

তথ্য নির্দেশ ও টীকা

১। আব্দুস সাত্তার, *আরণ্যসংস্কৃতি* (ঢাকা, মুক্তধারা, ১৯৭৭), পৃষ্ঠা ঃ ৪–৫

২। *দৈনিক ইত্তেফাক* (ঢাকা, ২ জুলাই ১৯৯০)

৩। *দৈনিক ইত্তেফাক* (ঢাকা, ২ জুলাই ১৯৯০)

৪। *জনসংখ্যাজরীপ* (ঢাকা, বিবিএস, ১৯৯১)

৫। ডেভিড সোফার, 'পপুলেশন ডিসলোকেশন ইন দ্যা হিল্ ট্রাক্টস্, *দি জিওগ্রাফিক্যাল রিভিউ–৫৩* (১৯৬৪), পৃষ্ঠাঃ ৩৩৭–৩৬২

৬। ডব্লিউ হান্টার, *এ স্ট্যাটিষ্টিক্যাল একাউন্ট অব বেঙ্গল* (নিউ দিল্লী, ডি কে পাবলিশিং হাউস,) ভল্যুম ৬, (১৯৭৩)

৭। সৈয়দ নাজমুল আহসান এন্ড ভূমিত্র চাকমা, 'প্রব্লেমস্ অব ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন ইন বাংলাদেশঃ দি চিটাগাং হিল ট্র্যাক্টস্', *এশিয়ান সার্ভে*, ভল্যুম ২৯, নং ১, (অক্টোবর ১৯৮৯)

৮। এফ কে খান এন্ড এ এল খীসা, 'শিফটিং কালটিভেশন ইন ইষ্ট পাকিস্তান', *ওরিয়েন্টালজিওগ্রাফার–১৪* (১৯৭০) পৃষ্ঠা ঃ ২২–৪৩

৯। অমরেন্দ্র লাল খীসা, 'পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম চাষ ঃ অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যত', *উপজাতীয় গবেষণা পত্রিকা* (রাঙ্গামাটি উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট), ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা (১৯৮২)

১০। হাবিবুর রহমান, 'পার্বত্য বাংলাদেশের জুম চাষ', *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা* (একবিংশ সংখ্যা, জুন ১৯৮৮)

১১। ফজলুর রশীদ খান, *বাংলাদেশেরসমাজতত্ত্ব* (ঢাকা, শিরীণ পাবলিকেশন, ১৯৭৪) পৃষ্ঠা ঃ ৫০

১২। খান ও খীসা, *পূর্বোক্ত*

১৩। আর এইচ এস হাচিনসন, *চিটাগাং হিলট্র্যাক্টস্* (দিল্লী, বিবেক পাবলিশিং, ১৯৭৮)

১৪। আহসান ও চাকমা, *পূর্বোক্ত*

১৫। আলমুট মে, *দি ইকোনমি অব শিফটিং কালটিভেশন ইন বাংলাদেশ* (মি মি ও বার্লিন ১৯৭৮)

১৬। সৈয়দ নাজমুল ইসলাম, 'দি চিটাগাং হিল ট্রাক্টস্ ইন বাংলাদেশঃ ইন্টিগ্রেশনাল ক্রাইসিস বিটুইন সেন্টার এন্ড পেরিফেরী', *এশিয়ান সার্ভে*, ভল্যুম ২১, নং ১২ (ডিসেম্বর ১৯৮১)

১৭। সোফার, *পূর্বোক্ত*

১৮। আর আই চৌধুরী এন্ড আদার্স, *ট্রাইবাল লীডারশীপ এন্ড পলিটিক্যাল ইন্টিগ্রেশন* (চিটাগাং ইউনির্ভাসিটি, ১৯৭৯)।

উল্লেখ্য যে, কাপ্তাই জল–বিদ্যুৎ প্রকল্প প্রতিষ্ঠার পর এখান থেকে যে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় তার ফলে উপজাতীয় অঞ্চলে তাৎক্ষণিক কোন উপকারই হয়নি। কেননা কাপ্তাই প্রকল্পের বিদ্যুৎ শক্তিকে ব্যবহার করে এ অঞ্চলে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের বিকাশ ঘটেনি এবং কুটির শিল্পেও কোনরূপ আধুনিকীকরণ সাধিত হয়নি। এমনকি উপজাতীয়দের গৃহে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছানোরও কোন বাস্তব সুযোগ ছিলনা। কেননা, উপজাতীয়দের বাসগৃহগুলো প্রধানত বাঁশ, বেত এবং লতা–পাতা দিয়ে তৈরী। এছাড়াও, বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন পাহাড়ের পাদদেশে ছড়িয়ে থাকার কারণে এ সুবিধা উপজাতীয়দের মধ্যে সম্প্রসারণ করা ছিলো রীতিমতো দুঃসাধ্য ব্যাপার। ফলে জল–বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনের মাধ্যমে অত্র অঞ্চলের জনগণের তাৎক্ষণিক কোন উপকারই হয়নি; বরং তাদের যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে।

১৯। আবুল বারকাত এন্ড সামশুল হুদা, 'পলিটেকোইকোনমিক এসেন্স অব এথনিক কনফ্লিক্টস্ ইন দ্যা চিটাগাং হিল ট্রাক্টস্ অব বাংলাদেশ', *সোসাল সায়েন্স রিভিউ* (ঢাকা ইউনিভার্সিটি), ভুল্যম ৫, নাম্বার ২, (ডিসেম্বর ১৯৮৮)

২০। পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা পরিসংখ্যান (ঢাকা, বি বি এস, ১৯৮৩)

২১। জুম বিজয় চাকমা, 'পার্বত্য জেলা পরিষদ নির্বাচনঃ অতঃপর', *দি মেইন স্ট্রিম* (ঢাকা, অনিয়মিত সংকলন, ১৯৯০)

২২। ইসলাম, *পূর্বোক্ত*

২৩। ইসলাম, *পূর্বোক্ত*

পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নে বিশেষ বরাদ্দ প্রদান, বিশেষ করে *পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ* প্রতিষ্ঠার পর থেকে অত্র অঞ্চলে যেসব অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে সেসব উন্নয়ন প্রকল্পগুলোতে কিছু সংখ্যক চাকমা ও মারমা ঠিকাদারীর সুযোগ গ্রহণ করেছে। এছাড়া শান্তিবাহিনীর আত্মসমর্পনকারী সদস্যদের চাকুরী এবং ব্যবসা ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। অধিকন্তু, পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ গঠিত হবার পর জেলা পরিষদের উপর অত্র জেলাসমূহে কর্মচারী নিয়োগের যেসব দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তার ফলেও বেশ কিছু উপজাতীয় পুরুষ ও মহিলা চাকুরীর সুযোগ লাভ করেছে। ফলে সাম্প্রতিককালে উপজাতীয় জনগণের বিশেষ করে চাকমা ও মারমাদের মধ্যে সুযোগ–সুবিধার মাত্রা কিছুটা সম্প্রসারিত হয়েছে।

২৪। এস, কামাল উদ্দিন, 'এ পিস ওফেনসিভ ইন দ্য হিলস' *ফার ইস্টার্ণ ইকোনমিক রিভিউ* (হংকং মে, ২–৮, ১৯৮০)

২৫। আহসান ও চাকমাঃ *পূর্বোক্ত*

২৬। আজিজুল হক, 'বাংলাদেশ ইন ১৯৮১ ঃ স্ট্রেইনস্ এন্ড স্ট্রেস', *এশিয়ান সার্ভে* (ভল্যুম ২১, নং ২)

২৭। *দৈনিকইত্তেফাক* (ঢাকা, ২ অক্টোবর, ১৯৭২)

২৮। এস, সামাদ এবং টি মুজমদার, 'পার্বত্য চট্টগ্রামে কি ঘটেছে?' *সাপ্তাহিকরাববার* (ঢাকা, ২০ জুলাই' ১৯৮০)

তৎকালীন সরকার যদিও পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালী বসতি স্থাপনকে উৎসাহিত করেছে কিন্তু একথাও সত্য যে, পার্বত্য জেলাসমূহের তুলনায় বাংলাদেশের অপরাপর জেলাসমূহে জনসংখ্যার আধিক্যজনিত চাপের স্বাভাবিক প্রবাহ এবং বিশেষ করে নোয়াখালী জেলার ব্যাপক ছিন্নমূল মানুষ নিকটবর্তী পার্বত্য জেলাসমূহে স্বতঃপ্রণোদিতভাবেই অনুপ্রবেশ করে বসতি স্থাপন করতে থাকে।

২৯। তালুকদার মনিরউজ্জামান, *গ্রুপ ইন্টারেস্ট এন্ড পলিটিক্যাল চেঞ্জেস ঃ স্টাডিজ অব পাকিস্তান এন্ড বাংলাদেশ* (সাউথ এশিয়ান, ১৯৮২)

৩০। *সাপ্তাহিকবিচিত্রা,* (ঢাকা, ১৭ বর্ষ, ২৭ সংখ্যা, ৯ ডিসেম্বর, ১৯৮৮)

৩১। কাজী মন্টু, 'ট্রাইবাল ইন্সার্জেন্সি ইন চিটাগাং হিল ট্রাক্টস', *ইকোনমিক এন্ড পলিটিক্যালউইকলি,* (ভল্যুম ১৫, নং ৩৬)

৩২। স্বাধীনতা দেওয়ান, 'বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের অসন্তোষের ইতিকথা', *লাড়েই* ট্রাইবাল স্টুডেন্ট ইউনিয়ন, বিজু সংকলন, বাংলা ১৩৯০

৩৩। স্বাধীনতা দেওয়ান, *ঐ*

৩৪। *বিচিত্রা,পূর্বোক্ত*

৩৫। জনসংহতি সমিতির প্রচারপত্র –১ (জুম জনগণের পক্ষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিকট পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতির পাঁচ দফা দাবীনামা)

৩৬। *দৈনিক বাংলা* (ঢাকা, ১ মার্চ, ১৯৮৯)

৩৭। জনসংহতি সমিতির প্রচারপত্র–২ (বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জাতীয় সংসদে আনীত পার্বত্য জেলা পরিষদ বিল–এর উপর জনসংহতি সমিতির বিবৃতি)

৩৮। জুম বিজয় চাকমা, *পূর্বোক্ত*

বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামের শিক্ষিত উপজাতীয়দের মধ্যে এই ধারণা শক্তিশালী হচ্ছে যে, সশস্ত্র প্রতিরোধের পরিবর্তে বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতির মুলস্রোতের সাথে মিশে গিয়ে

নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন এবং জনমত গঠনের মাধ্যমে উপজাতীয়দের অধিকার প্রতিষ্ঠা সহজতর হবে।

৩৯। এরশাদ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ, *দৈনিক বাংলা* (ঢাকা, ২৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৯)

৪০। *দৈনিকনয়াবাংলা* (ঢাকা, ১ নভেম্বর ১৯৮৩)

৪১। পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের ১ম কেন্দ্রীয় সম্মেলনে (ঢাকা, ১ জুলাই ১৯৯১) প্রধান অতিথির ভাষণে জাতীয় সংসদ সদস্য দীপঙ্কর তালুকদার পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে শীঘ্রই জাতীয় সংসদে একটি বিল উথাপন করা হবে বলে উল্লেখ করেন। কিন্তু অদ্যাবধি (৩ ডিসেম্বর ১৯৯১) পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রশ্নে সরকারী বা বিরোধী দল কোন পক্ষ হতেই কোন বিল সংসদে উথাপিত হয়নি। তবে বাংলাদেশের ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এ সমস্যার রাজনৈতিক নিষ্পত্তির বিষয়টি বর্তমানে যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হচ্ছে।